PAPER CUTTING June 2023

সম্পাদকীয় আনন্দবাজার পত্রিকা

WBCS Bengali Compulsory Paper

9000+ WBCS aspirants

জুড়ে আছে আমাদের সঙ্গে ।

WHATSAPP - 8537872204

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

Online fraud ফাঁদ

অতিমারিতে স্তব্ধ হয়েছিল পর্যটন, বিপুল আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছিল এই ক্ষেত্রটি। গত দু'বছরে তা অনেকটাই পূরণ হয়েছে, জীবনে স্বাভাবিক ছন্দ ফিরতেই মানুষ বেরিয়ে পড়েছেন ভ্রমণে। ভারতে পর্যটন পরিষেবার মূল আর্থিক বিষয়গুলি, যেমন থাকার জায়গা, গাড়ি বুকিং ইত্যাদি ক্রমশ ডিজিটাল ব্যবস্থায় হচ্ছে। বহু পর্যটক এখন আন্তর্জালে নিজেদের পছন্দ ও সাধ্যমতো বেড়ানোর জায়গা, হোটেল হোমস্টে গাড়ি ইত্যাদির তথ্য সংগ্রহ করেন, ওয়েবসাইট বা ফোনে যোগাযোগ করে, ডিজিটাল ব্যবস্থায় টাকা পাঠিয়ে অগ্রিম বুকিং করেন। সরকার পরিচালিত পর্যটন-আবাসগুলি সরকারি বলেই এখনও 'বিশ্বাসযোগ্য', অসরকারি পরিষেবার ক্ষেত্রে ফোনে বা সমাজমাধ্যমে অন্য প্রান্তের তথাকথিত অচেনা মানুষটিকে বিশ্বাস করতেই হয়। এই বিশ্বাস, বা বিশ্বাসজাত অসতর্কতার সুযোগেই মাঝখানে ফাঁদ পাতে প্রতারকেরা। সাইবার সুরক্ষা নিয়ে কাজ করে, এমন একটি বহুজাতিক সফটওয়্যার সংস্থা সাতটি দেশের মোট সাত হাজার পর্যটককে নিয়ে সমীক্ষা করেছিল, তাদের রিপোর্টে উঠে এসেছে ভারতীয় পর্যটকদের উদ্বিগ্ন ছবি: ৫১ শতাংশ ভ্রমণে টাকা বাঁচাতে গিয়ে অনলাইন জালিয়াতির শিকার হয়েছেন, ভ্রমণ শুরুর আগেই অনলাইন টাকা খুইয়েছেন অনেকে, বুকিং-এর টাকা দিতে গিয়ে প্রতারিত হয়েছেন ২৭ শতাংশ, তথ্য চুরি গিয়েছে ৩৬ শতাংশ পর্যটকের ইত্যাদি।

ভারতের মতো দেশে পর্যটকেরা নানা আর্থ-সামাজিক অবস্থানভুক্ত। বহু মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষ বছরভর পয়সা জমিয়ে সপরিবার এক-দু'বার বেড়াতে যান; প্রবাসী সন্তানের সঙ্গবঞ্চিত বৃদ্ধ মা-বাবা অনেক সময় মন ভাল রাখতে বেরোন তীর্থভ্রমণে। এই সব ক্ষেত্রেই চাকা গড়ানোর আগেই ডিজিটাল জালিয়াতির কারণে অর্থহানি হলে তা ভ্রমণের সাধ ও সাধ্য দুইয়ের উপরেই প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দেয়— টাকা তো খোয়া যায়ই, নিবে যায় বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছাও। ডিজিটাল প্রযুক্তি বা লেনদেনে অনভ্যস্ত যে কেউ অতি সহজে প্রতারকের কবলে পড়তে পারেন, আন্তর্জালে হোটেল বা গাড়ি বুকিং-এর ফোন নম্বরে কারচুপি করে জালিয়াতেরা অনেক সময়েই নিজেদের ফোন নম্বরের ফাঁদ পেতে রাখে, যে কেউ তাঁদের খপ্পরে পড়তেই পারেন। ডিজিটাল পরিসরে তথ্য ও অর্থের লেনদেনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিষয়ে যে তাঁরা সতর্ক নন, সমীক্ষায় স্বীকার করেছেন ৩১ শতাংশ ভারতীয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই জালিয়াতির সুরাহা হয় না। প্রযুক্তির দ্বারা নিমেষে তা সাধিত হয়, এবং পুলিশের কাছে অভিযোগ জমা পড়তে পড়তেই দেখা যায় প্রতারকেরা পগার পার। উত্তরোত্তর এই প্রতারণা রূপ পাল্টাচ্ছে: পর্যটকেরা সাশ্রয়ের আশায় নতুন বা কমদামি হোটেল, নয়া বুকিং পরিষেবা বা নিত্যনতুন বেড়ানোর জায়গার খোঁজ করে থাকেন, দেখা যায় এই 'নতুন'-এর মধ্যেই ঢুকে আছে জালিয়াতির ভূত। সবচেয়ে বড় কথা, এখনও পর্যন্ত এই সমস্যা পর্যটকের ব্যক্তিগত সমস্যা বলেই বিবেচিত; পুলিশ বা সরকার এগুলিকে 'নাগরিক সমস্যা' মনে করে না, সতর্কবার্তা দিয়েই কাজ শেষ। পর্যটকের সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন তো আছে অবশ্যই, তবে সচেতন হওয়া দরকার প্রশাসনেরও। কোথায় কোন কুনাগরিক প্রতারণার ফাঁদ পেতে বসেছে, তাকে বাগে আনার পন্থা পরের কথা, খবরটুকু তো প্রশাসনের কাছে থাকবে!

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

Migrant Workers পরিযায়ী সুরক্ষা

পরিযায়ী শ্রমিকদের সহায়তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি বেশ কিছু ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেছে। তার কেন্দ্রে রয়েছে পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ (ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড) গঠন। সরকার জানিয়েছে, বিপদগ্রস্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের সাহায্যের জন্য চব্বিশ ঘণ্টার সহায়তা কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে এবং কেরল, দিল্লি, মহারাষ্ট্রে আঞ্চলিক অফিস নির্মাণ করা হবে। এ ছাড়াও দুর্ঘটনার শিকার হয়ে কোনও পরিযায়ী শারীরিক ভাবে অক্ষম হয়ে পড়লে তিনি পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ টাকা অবধি অর্থসাহায্য পাবেন। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে তাঁর পরিবার পাবে দু'লক্ষ টাকা। পরিযায়ীদের নাম নথিভুক্তির জন্য একটি পোর্টালও শুরু করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি গ্রাম থেকে শ্রমজীবী মানুষ আজ ভিনরাজ্যে কাজ করতে যান। অতএব তাঁদের সুরক্ষা এবং কল্যাণের প্রয়োজন ব্যাপক ভাবে অনুভূত হচ্ছে। এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েও কিছু প্রশ্ন তোলা দরকার।

যেমন, শ্রমিক বিপদে পড়লে কী সহায়তা পাবেন, তার উপরে সরকারি ঘোষণায় এত গুরুত্ব দেওয়া হল কেন? তাঁরা বিপদে যাতে না পড়েন, তার জন্য কী পদক্ষেপ করছে সরকার? পরিযায়ীদের দুর্দশার কারণগুলি চিহ্নিত করে আগাম প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তাঁদের সুরক্ষায় ১৯৭৯ সালে যে আইন প্রণয়ন হয়েছিল, এখনও তার নির্দেশগুলি মানা হয় না এ রাজ্যে। সেই কারণেই শ্রমিকদের বিপন্নতা বেড়েছে। তাঁদের গতিবিধি সম্পর্কে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি করতে হলে কেবল পোর্টাল তৈরি করলেই চলবে না। প্রয়োজন নিয়মিত সমীক্ষা, যার জন্য দরকার গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক প্রশাসন এবং শ্রম দফতরের সমন্বয়। রাজ্য ছাড়ার আগেই পরিযায়ীদের নামধাম নথিভুক্ত করার কাজটি দীর্ঘ দিন অবহেলিত। নাম নথিভুক্তির কোনও নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া যখন রাজ্যে চালু নেই, তখন পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় আটত্রিশ লক্ষ— এই তথ্যের ভিত্তি কী? এই অস্বচ্ছতা অনভিপ্রেত।

সর্বোপরি, কেবল তথ্য সংগ্রহই যথেষ্ট নয়। শ্রমিকরা যেন তাঁদের সামাজিক এবং মজুরির সুরক্ষা সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হয়ে কাজ করতে যান, তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। যে রাজ্যগুলিতে বাংলা থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের চলাচল বেশি, সেগুলির প্রশাসনের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের নির্দিষ্ট সমঝোতা করা দরকার। তাঁদের পরিস্থিতির ভয়াবহতা এবং তাঁদের প্রতি প্রশাসনের উদাসীনতা প্রকট করেছিল অতিমারি ও লকডাউন। কাজ, বাসস্থান হারিয়ে কার্যত তাঁদের রাস্তায় এসে দাঁড়াতে হয়েছিল। নিয়মিত রোজগার বা ন্যূনতম সামাজিক সুরক্ষা না থাকায় বিকল্প পথও কিছু ছিল না। অথচ, 'আন্তঃরাজ্য পরিযায়ী শ্রমিক আইন, ১৯৭৯' অনুসারে পরিযায়ীদের বিনামূল্যে বাসস্থান, স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। বাস্তবে দেখা যায়, কোনও রকম সামাজিক নিরাপত্তা ছাড়াই শ্রমিকরা অস্বাস্থ্যকর, অমানবিক পরিস্থিতিতে দিন কাটান। ঠিকাদার এবং নিয়োগকারীর প্রতারণা এবং নির্যাতনের শিকার হন। এই সব অন্যায়ের নিরসন প্রয়োজন। বাঙালি শ্রমিক ভিনরাজ্যে মারা গেলে পরিবার কত টাকা পাবে, বা সৎকারের জন্য কত টাকা দেবে সরকার, তার চাইতে অনেক বেশি জরুরি, পরিযায়ী শ্রমিকের সুস্থ ও সুরক্ষিত কর্মজীবন।

Indian Education System(বি)ভ্রান্তিবিলাস

উত্তর অজানা, আবার প্রশ্নগুলোও মোটেই সহজ নয়। কেন্দ্রের জাতীয় শিক্ষানীতি, বা তার অন্তর্ভুক্ত কারিকুলাম অ্যান্ড ক্রেডিট ফ্রেমওয়ার্ক-এর অধীনে কলেজগুলিতে চার বছরের স্নাতক কোর্স চালু নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ গোড়ায় বিস্তর প্রতিবাদ করেছিল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, সেই চার বছরের অনার্স পাঠক্রম রাজ্য শুধু মেনেই নেয়নি, কলেজগুলিকে সেই মর্মে ভর্তিও শুরু করতে বলেছে অতি সম্প্রতি। উচ্চ মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ হয়েছে বেশ কিছু দিন, রাজ্যের শিক্ষা দফতরের তরফে কোনও নির্দেশ না আসায় সমগ্র ভর্তি প্রক্রিয়াই থমকে ছিল। তার একটি কারণ যদি হয়ে থাকে চার বছরের অনার্স নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দেরি, আর একটি কারণ কেন্দ্রীয়, অভিন্ন পোর্টাল তৈরি ও চালু করা নিয়ে গড়িমসি— কলেজে ভর্তির প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও অন্যায্য সুবিধামুক্ত করতে যার কথা অনেক দিন ধরে চলে আসছে। এ বছরও তা হল না।

চার বছরের অনার্স কোর্স চালু না হলে রাজ্যের ছেলেমেয়েদের অসুবিধা হবে, সর্বভারতীয় স্তরে প্রতিযোগিতায় তারা পিছিয়ে পড়বে, অন্য বহু রাজ্য যে-হেতু চার বছরের অনার্স শুরু করে দিয়েছে, ছেলেমেয়েরা হয়তো অন্য রাজ্যে পড়তে চলে যাবে— বলেছেন শিক্ষামন্ত্রী। সে জন্যই এই সিদ্ধান্ত। তা-ই যদি হয়, তবে এই সমস্ত ‘বাস্তববাদী’ দিক খতিয়ে দেখে, সর্বোপরি ছাত্রছাত্রী-অভিভাবক ও শিক্ষকদের মতামত শুনে, এবং তাঁদের ভাল করে বুঝিয়ে এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন ছিল আগে থেকেই; এত দিন শিক্ষানীতি ও চার বছরের অনার্সের বিরোধিতা করে, আজ হঠাৎ বিবৃতি দিয়ে সেই মর্মে ভর্তি শুরু করতে বলার ধাক্কাটি না দিয়ে। কেন্দ্রের শিক্ষানীতির প্রতি রাজ্যের মনোগত অনুভবটি ঠিক কী, এ নিয়ে কি বিভ্রান্তি তৈরি হল না এতে? শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন রাজ্য কেন্দ্রের শিক্ষানীতি মেনে নেয়নি, বরং জাতীয় শিক্ষানীতির ভাল দিকগুলি নিয়ে কিছু দিনের মধ্যে রাজ্যের নিজস্ব শিক্ষানীতি তৈরি হবে। ভর্তির অভিন্ন পোর্টাল তৈরি করে উঠতেই এত দেরি— রাজ্যের শিক্ষানীতি কবে হবে, তাতে কী-ই বা থাকবে, কেন্দ্র-রাজ্যের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের শিকার শেষে পড়ুয়ারা হবে কি না, এই প্রশ্নগুলির কোনও উত্তর নেই, নেই উত্তর দেওয়ার মানুষও।

প্রশ্নের শেষ নয় এখানেই। কলেজগুলিকে চার বছরের অনার্স কোর্স শুরু করতে বলা হল, সঙ্গে এও বলা হল যে, আপাতত কাজ চালাতে হবে কলেজের নিজস্ব পরিকাঠামো ব্যবহার করেই, এমনকি প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহও করবে কলেজগুলিই। দেরি করে করে তার পর আচমকা এক সিদ্ধান্ত ও ঘোষণা, অভিন্ন পোর্টালের অনুপস্থিতি, উপরন্তু এখন কলেজগুলিকেই অর্থ ও পরিকাঠামোর সংস্থান করতে বলা, রাজ্যের তরফে এ কি এক প্রকার হাত তুলে নেওয়া নয়? যে ছাত্রছাত্রীরা জেনারেল ডিগ্রির জন্য পড়বে, তাদের পাঠক্রম ক’বছরের হবে বলা হয়নি। কোভিডের জন্য গত তিন বছর ভর্তির আবেদন ফি নেয়নি কলেজগুলি, এ বার তাদের ‘অর্থ সংগ্রহ’ করতে বলা মানে কি আবেদন ফি-সংগ্রহে প্রত্যাবর্তন? নতুন অনার্স ব্যবস্থা কার্যকর করার পরিকাঠামো রাজ্যের সব কলেজে আছে কি না রাজ্যের তরফে তা দেখার কোনও ব্যবস্থা নেই, নেই তাগিদও, সিদ্ধান্ত ঘোষণাই কাজ শেষ। এত সব বিভ্রান্তির গোলকধাঁধায় এ রাজ্যের কলেজশিক্ষার পঠনপাঠন কোথায় যাবে, তা ভাবতেই আশঙ্কা হচ্ছে।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

Surrogacy শরীরের অধিকার

মাতৃত্ব ‘স্বাভাবিক’ উপায়েই আসুক, অথবা সারোগেসি-র মাধ্যমে, উপযুক্ত সুরক্ষার প্রয়োজন উভয় ক্ষেত্রে। কারণ, উভয় ক্ষেত্রেই ‘মা’-কে একই রকম শারীরিক পরিবর্তনগুলির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়। অথচ, সারোগেসির প্রতি একটি সামাজিক অবজ্ঞা, অসূয়া এ দেশে প্রবল— যেন সেই প্রক্রিয়াটি প্রকৃত মাতৃত্বের নয়। সেই অবহেলা শুধু সামাজিক নয়, প্রাতিষ্ঠানিকও বটে— এত দিন সারোগেট মা-রা বিমার আওতার বাইরে থাকতেন। এই বৈষম্য কিছুটা দূর করতে সম্প্রতি উদ্যোগী হয়েছে ভারতের বিমা নিয়ন্ত্রক আইআরডিএআই। যিনি গর্ভ ভাড়া দেবেন এবং যিনি ডিম্বাণু দান করবেন, উভয়কেই মূল বিমার মধ্যে নিয়ে আসতে উদ্যোগী হয়েছে তারা। এ-হেন উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে সারোগেট মায়ের সন্তান প্রসব সংক্রান্ত খরচ মেটাবে বিমা সংস্থা। এই উদ্যোগ স্বাগত। এতে যে শুধুমাত্র এই প্রক্রিয়ায় সন্তানধারণে ইচ্ছুক দম্পতির উপর আর্থিক চাপ কিছুটা লাঘব হল, তা নয়, সারোগেট মা-র সার্বিক ভাবে ভাল থাকার অধিকারটিও প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেল।

সুরক্ষাকবচের এ-হেন উদ্যোগ বর্তমান সময়ের সাপেক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কৃত্রিম প্রজনন প্রক্রিয়ার উন্নতি শুধুমাত্র সন্তানহীন দম্পতিদেরই নয়, লিঙ্গ-নির্বিশেষে সকলের কাছেই সন্তানলাভের সুযোগ এনে দিয়েছে। সারোগেসি এ ক্ষেত্রে অন্যতম জনপ্রিয় এক মাধ্যম। ভারতে ২০০২ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে বাণিজ্যিক ভাবে গর্ভ ভাড়া দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং বহু আর্থিক ভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবার এর সুযোগ গ্রহণ করে জীবনধারণের স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে নেয়। কিন্তু, এর অন্ধকার দিকও ছিল— স্ত্রীকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সন্তানধারণে বাধ্য করা, দালালচক্রের প্রতারণা, আধা-অবৈধ চিকিৎসা-ব্যবসায়ীদের শোষণ তার কয়েকটি মাত্র। এর থেকে সারোগেট মায়েদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য নিশ্চিত ভাবেই আইনি রক্ষাকবচের প্রয়োজন ছিল। ২০১৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার বিল পেশ করল বটে, কিন্তু তাতে পরিবারতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ কঠোরতর হল মাত্র— বলা হল, গর্ভ ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিকীকরণ চলবে না। শুধুমাত্র নিকটাত্মীয়রাই এতে যোগ দিতে পারবেন, যেখানে চিকিৎসা-ব্যয় ছাড়া অন্য কোনও অর্থের লেনদেন থাকবে না। সারোগেসি অ্যাক্ট, ২০২১ সালের মূল কথাও এটাই।

আইনের সাহায্যে সারোগেসি-র বিষয়টিকে পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার এই প্রচেষ্টা মেয়েদের শরীরের উপরে নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার বিরোধী। এই আইনের প্রধান সীমাবদ্ধতাই হল এই যে, প্রজননের ক্ষেত্রে মেয়েদের নিজস্ব ইচ্ছার উপরে স্থান দেওয়া হল পরিবারের প্রয়োজনকে, অর্থাৎ ইচ্ছা থাকলেও তিনি পরিবারের বাইরে কারও জন্য গর্ভ দান করতে পারবেন না। দ্বিতীয়ত, এই মডেল-এ আশা করা হল, অন্যের প্রয়োজনে এক জন নারী মাতৃত্বকালীন শারীরিক এবং মানসিক চাপ নেবেন, অথচ এর জন্য আর্থিক সুবিধা পাবেন না। অর্থাৎ, নারীর স্বেচ্ছাশ্রমের সেই পুরনো ধারণাটিই প্রতিষ্ঠিত হল, যাতে তিনি তাঁর কাজের জন্য পারিশ্রমিক দাবি করতে পারবেন না। সারোগেসিকে মাতৃত্বের মূল স্রোতে শামিল করতে গেলে সর্বাগ্রে এই আইনটির সংশোধন জরুরি। গর্ভদাত্রীর আর্থিক সুরক্ষার পাশাপাশি তাঁর স্বাধীন ইচ্ছাটিকেও স্বীকৃতি দিতে হবে। নারীর ক্ষমতায়নের জন্যই এই পদক্ষেপ প্রয়োজনীয়।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

migrant labour বালির বাঁধ

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত কর্মীদের বর্তমান প্রয়োজন কতখানি, তা যাচাই করতে এবং কাজের সন্ধানে প্রশিক্ষিত ও অপ্রশিক্ষিত কর্মীদের রাজ্যের বাইরে যাওয়ার প্রবণতার মূল্যায়ন করতে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে ৪৪ সদস্যের কমিটি গড়েছে রাজ্য সরকার। এমত উদ্যোগের মূল লক্ষ্য, পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান, যাতে কাজের বাজারের প্রয়োজন অনুযায়ী সেই প্রশিক্ষিত কর্মী এই রাজ্যেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিযুক্ত হতে পারেন। একই সঙ্গে কমিটি দেখবে, বাংলা থেকে কত জন প্রশিক্ষিত এবং অপ্রশিক্ষিত কর্মী অন্য রাজ্যে কাজ করছেন। প্রসঙ্গত, কিছু দিন পূর্বে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক আলোচনাতে রাজ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ খোঁজার উপর জোর দিয়েছিলেন, এবং তরুণদের উৎসাহ দিয়েছিলেন যাতে তাঁরা রাজ্য সরকারের স্বনিযুক্তি প্রকল্পগুলির সুবিধা নিতে পারেন। সাম্প্রতিক রেল-দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রতিনিয়ত যে বিপুল সংখ্যক কর্মী কাজের খোঁজে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেন— সরকারি হিসাব অনুযায়ী কমবেশি চল্লিশ লক্ষ— তাঁদের নিয়ে আবার রাজ্য সরকারের প্রতি আক্রমণ শানানো চলছে। রেল-দুর্ঘটনার সঙ্গে এই সমস্যাকে জড়িয়ে ফেলার মধ্যে রয়েছে নিছক কু-রাজনীতি। তবে সমস্যাটি যে বিরাট, এবং ভয়ঙ্কর, তাতে সংশয় নেই। পঞ্চায়েত ভোটের মুখে সেই স্রোত রাজ্যের শাসক দলেরও মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠছে। বালির বাঁধে স্রোত আটকায় কি না, সে প্রশ্ন পৃথক। কিন্তু সরকার বাঁধ দেওয়ার চেষ্টা করছে, এমন একটি দৃশ্যপট রচনা করার রাজনৈতিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

সরকার রাজ্যের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতেই পারে। তাঁদের জন্য যদি রাজ্যের মধ্যেই কর্মসংস্থান হয়, তাও সুসংবাদ। প্রশ্ন হল, পশ্চিমবঙ্গে সমস্যা কি জোগানসংক্রান্ত— অর্থাৎ, রাজ্যে যথেষ্ট সংখ্যক প্রশিক্ষিত কর্মী নেই; না কি চাহিদাসংক্রান্ত— অর্থাৎ, রাজ্যে যথেষ্ট কাজের সুযোগ নেই? উত্তরটি রাজ্যবাসী বিলক্ষণ জানেন— যাঁরা কাজের সন্ধানে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিতে বাধ্য হচ্ছেন, তাঁরা আরও বেশি জানেন। ফলে, শ্রমিক-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে এই রাজ্য থেকে ভিনরাজ্যে কাজ করতে যাওয়ার প্রবণতায় রাশ টানা যাবে না। কথাটি এমনই স্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন এবং অনস্বীকার্য যে, মুখ্যমন্ত্রী-সহ প্রশাসনের শীর্ষস্থানীয়রা তা বুঝতে পারেননি, তা বিশ্বাস হয় না।

ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী বহু বার পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন, এমনকি বাণিজ্য সম্মেলনের আয়োজনও করেছেন। কিন্তু পরিস্থিতি পাল্টায়নি। শিল্পের জন্য জমি জোগাড়ের পথে রাজনৈতিক বাধাও দূর হয়নি। অতিমারি দেখিয়ে দিয়েছিল ভিনরাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের বিপন্নতা। ভিনরাজ্যে থাকাকালীনও বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে হয় তাঁদের। অসুরক্ষিত অবস্থায় কাজ করতে গিয়ে প্রাণহানিও ঘটে। তবুও সেই প্রবণতায় ভাটা পড়ে না। পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের পথে বাধা প্রচুর— এ রাজ্যের বর্তমান রাজনীতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে শিল্পসম্ভাবনাকে বলি দিয়ে— তার এক দিকে রয়েছে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা, অন্য দিকে রয়েছে সর্বগ্রাসী সিন্ডিকেট রাজ। কাজেই, পরিযায়ী শ্রমিকের কথা ভাবতে হলে শেষ পর্যন্ত রাজ্যে শিল্পায়নের ব্যবস্থা করা ভিন্ন উপায় নেই, এই কথাটি মুখ্যমন্ত্রীকে স্বীকার করতেই হবে।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -
https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

Wastage of Water জলের মতো কঠিন

মেয়র ফিরহাদ হাকিম যথার্থই বলেছেন, জল অপচয় রোধ করা না গেলে শহর কলকাতায় জলের চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। গত এক দশকে পুরসভা পানযোগ্য জলের উৎপাদন বাড়িয়েছে দৈনিক ২ কোটি ৮৫ লক্ষ গ্যালন থেকে ৫ কোটি ১০ লক্ষ গ্যালন, কিন্তু তাতেও চাহিদা মেটাতে পারছে না, স্বীকার করেছেন মেয়র। এর কারণ, প্রতি দিন পুরসভার সরবরাহ করা পরিস্রুত জলের ত্রিশ থেকে চল্লিশ শতাংশ নষ্ট হয়। প্রশ্ন হল, অপচয় হচ্ছে জেনেও তা কেন রোধ করতে পারছে না পুরসভা? কলকাতাতেই প্রতি গ্রীষ্মে যাদবপুর, কসবা, বেহালা-সহ বেশ কিছু ওয়র্ডে তীব্র জলকষ্টের শিকার হন বহু মানুষ। তা সত্ত্বেও বিপুল পরিমাণ পরিস্রুত জল নষ্ট হচ্ছে, তার দায় কার? পুরকর্তাদের মতে, তা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না, কারণ জলের মিটার বসানো নেই গৃহস্থ বাড়ি বা বৃহৎ আবাসনে। দিনে মাথাপিছু দেড়শো লিটার জল এক ব্যক্তির প্রয়োজন মেটাতে যথেষ্ট, মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। কোথায় নিয়মিত তার চেয়ে বেশি খরচ হচ্ছে, অথবা মাটির নীচে পাইপের ছিদ্র থেকে জল নষ্ট হচ্ছে কোথায়, তা বলে দিতে পারে জলের মিটার।

জলের মিটার বসানোর পাইলট প্রকল্প কলকাতায় চালু হয়েছে অনেক আগেই, যখন মেয়র পদে আসীন ছিলেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। বছর ছয়েক আগে এক নম্বর বরো এক থেকে পাঁচ নম্বর ওয়র্ডের সমস্ত বাড়িতে মিটার বসানোর কাজ শুরু হয়েছিল। কাশীপুর, টালা, সিঁথি, বেলগাছিয়া, নর্দার্ন অ্যাভিনিউ এলাকায় সেই কাজ শেষ হয়েছে। দক্ষিণ কলকাতা, পূর্ব কলকাতা ও জোকায় কাজ শুরু হয়ে যাওয়ার কথা ছিল এ বছরের গোড়ায়। কাজের এমন শ্লথ গতির জন্য দায়ী কে? যে সব জায়গায় মিটার বসেছে, সেখান থেকেই বা অপচয় সংক্রান্ত কী তথ্য মিলেছে, প্রতিরোধের জন্য কী পরিকল্পনা করা হয়েছে? মেয়র সে বিষয়ে কিছুই বলেননি। নগরবাসী কেবলই দেখছে, গৃহস্থের ট্যাঙ্ক উপচে, রাস্তার মুখহীন কলে, ভূগর্ভে পাইপের ছিদ্র দিয়ে বিপুল জল নষ্ট হচ্ছে। কেবল তা-ই নয়, জলের অপূর্ণ চাহিদা মেটাতে ভূগর্ভের জল তুলছে বহু আবাসন। এই জলের পরিমাণ কত, সে তথ্য জানার উপায়ও নেই পুরসভার। কিন্তু কলকাতায় ভূগর্ভের জলের স্তর যে ক্রমশ নেমে যাচ্ছে, সে তথ্য মিলেছে। ফলে পানীয় জলে আর্সেনিক দূষণের ভয়ও বাড়ছে।

বিষয়টি যে পুরসভার কাছে যথাযথ গুরুত্ব পায়নি, তার কারণ সম্ভবত রাজনৈতিক। জলের মিটার বসালেই গুঞ্জন শুরু হয়, এ বার জলকর বসবে। হয়তো সেই জন্যেই মিটার বসানোয় রাজনৈতিক অনীহা রয়েছে। দিল্লিতে কিন্তু আপ সরকার জলের মিটার বসাতে পেরেছে একুশ লক্ষেরও বেশি গৃহস্থ বাড়িতে, তার মধ্যে রয়েছে অবৈধ বস্তিও। বিনামূল্যে সরবরাহ করা জলের ঊর্ধ্বসীমা করেছে প্রতি মিটারে দৈনিক ৬৬৭ লিটার। বিশেষজ্ঞদের মতে, জলের অপচয় এড়াতে সকাল-বিকেল অল্প সময় জল সরবরাহের নীতিতে হিতে বিপরীত হয়— অনেক ব্যবসায়ী সেই সময়ে জল ভরে রেখে, পরে তা বিক্রি করেন বস্তিবাসীদের। জলের মিটার বসিয়ে অপচয়ের হিসাব, এবং বিনামূল্যে পাওয়া জলের ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া, এই দুটোই জল বাঁচানোর কার্যকর উপায় হতে পারে। কঠিন বলেই কর্তব্যে অবহেলা করা চলে না।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

Attack on Journalists মুদ্রার দুই পিঠ

সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। ভারতে রাজনীতিকদের হাতে সাংবাদিকদের ‘আক্রান্ত’ হওয়ার ট্র্যাডিশন— মন্ত্রীকে প্রশ্ন করলে উত্তরে প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য হুমকির ট্র্যাডিশন, নেতাকে নিয়ে অপ্রিয় খবর করার ‘অপরাধ’-এ সাংবাদিকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার ট্র্যাডিশন। ভারতীয় সাংবাদিকেরা এ-হেন পরিস্থিতিতে এখন আর অনভ্যস্ত নন, রাজনীতিকদের সাঙাত-শাগরেদ-বাহুবলীর মতো কায়মনোবাক্যের রক্ষীও তাঁদের প্রয়োজন হয় না, পেশাগত ও ব্যক্তিগত আক্রমণের মুখেও সংবাদ ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতাই তাঁদের প্রথম ও শেষ রক্ষাকবচ। আসল দ্রষ্টব্য সাংবাদিকরা নন, রাজনীতিকরা— তাঁদের দমনযন্ত্রকুশলতার বিচিত্রতায়। অমেঠীতে চায়ের ভাঁড় হাতে গাড়িতে ওঠার সময় এক সাংবাদিক ‘বাইট’ চাওয়ায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি বললেন, ওই সাংবাদিক আসলে তাঁকে ও তাঁর নির্বাচনী ক্ষেত্রকে অপমান করছেন, তিনি ওই সাংবাদিকের অফিস তথা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ‘কথা’ বলবেন। কেরলের এর্নাকুলামে এক টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক এক ছাত্রনেতার কাজকর্মের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ নিয়ে খবর করেছিলেন, পত্রপাঠ তাঁর বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর নিল পুলিশ। দেশের দুই প্রান্তে দু’টি ঘটনা, কিন্তু সাংবাদিক-দমনে সমান মরিয়া, এবং নির্লজ্জ।

আরও ভেবে দেখার ব্যাপার— সাংবাদিককে চোখ রাঙানোর কাজে এ দেশের রাজনীতিকদের ‘পারফরম্যান্স’ দলনিরপেক্ষ। অমেঠীতে যে কাজ করেন কেন্দ্রীয় তথা বিজেপির মন্ত্রী, পিনারাই বিজয়নের কেরলে তা-ই করছেন বাম ছাত্রনেতা। অন্তত ঘোষিত ও প্রচারিত রাজনৈতিক আদর্শের নিরিখে বিজেপি ও সিপিএম-এর চেয়ে বেশি বিপরীত দলের সন্ধান পাওয়া দুষ্কর, কিন্তু স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধে তাদের তৎপরতা ও পারদর্শিতায় বিস্ময়কর রকমের মিল। অন্য দলগুলির অতীত বা বর্তমানই বা কম কিসে— জরুরি অবস্থাকালীন ইন্দিরা গান্ধী সরকারের হাতে সংবাদ-স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ যেমন ভারতীয় গণতন্ত্রের মুখে অনপনেয় কালিমা লেপন করেছিল, তেমনই আজকের পশ্চিমবঙ্গেও সংবাদমাধ্যম স্বাধীন, সেই দাবি করার উপায় নেই। বিজেপি জমানায় সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার সূচকে ভারতের স্থান ক্রমে নিম্নমুখী, আন্তর্জাতিক স্তরেও তা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, অথচ রাজনীতিকদের তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। কেন্দ্রে যে বিরোধী দল সাংবাদিক-পীড়নের বিরোধিতায় মুখর, দেখা যাচ্ছে অন্য রাজ্যে শাসক দল হিসাবে তারাই সাংবাদিক-নিগ্রহে অভিযুক্ত।

অমেঠীর বিপিন যাদব বা এর্নাকুলামের অখিলা নন্দকুমারদের উপর রাজনীতিকদের আঘাত আসছে, সাংবাদিক হিসাবে তাঁরা তাঁদের কাজটি করেছেন বলে। সে কাজ প্রশ্ন করার কাজ, গণতন্ত্রে নেতা-মন্ত্রী তথা জনপ্রতিনিধিমাত্রেই যে প্রশ্নের উত্তর দিতে সাংবিধানিক ভাবে দায়বদ্ধ। স্রেফ প্রশ্ন করার জন্য সাংবাদিকের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলার হুমকি আসলে রাজনীতিকের মনোগত নিরাপত্তাহীনতাই প্রকট করে। শুধু একটি খবর করার জন্য যদি এ দেশে সাংবাদিকের বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর হয়, পুলিশ জেরা করতে ডেকে পাঠায়, তা হলে ‘সংবাদ-স্বাধীনতা’, ‘বৃহত্তম গণতন্ত্র’-এর মতো উচ্চভাবের শব্দগুলি কদাপি উচ্চারিত না হলে ভাল— কোনও রাজনৈতিক দলের মুখেই

Dowry পণের দাবি

নিরুপমাকে মরতে হয়েছিল তার বাবা পাত্রপক্ষের চাহিদামতো পণের টাকা জোগাড় করতে পারেননি বলে। রবীন্দ্রনাথের ‘দেনাপাওনা’ গল্পের নায়িকার সময় একশো বছরেরও আগের, সমাজ ছিল পশ্চাৎপদ, রক্ষণশীল, শিক্ষার আলোকবঞ্চিত। কিন্তু কেবল পিছিয়ে থাকা, রক্ষণশীল, কম শিক্ষিত সমাজেই পণপ্রথা বলবৎ থাকে— এই ভাবনা অতিসরলীকৃত। সম্প্রতি আমেরিকার দু’টি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমীক্ষা তা নতুন করে ফের প্রমাণ করল। সমীক্ষা বলছে, ভারতীয় পুরুষদের মধ্যে শিক্ষা এবং কাজের সুযোগ যত বৃদ্ধি পেয়েছে, পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে পণপ্রথাও। বিশেষত, গত শতকের চল্লিশ থেকে আশির দশকের মধ্যে এই প্রবণতা ছিল সর্বাধিক। দেখা গিয়েছে, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বেতনের নিরিখে পাত্র যত উপরের সারিতে উঠেছে, তার পণের দাবিও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত, যে পরিবারে কন্যার বিবাহে মোটাটাকা পণ দিতে হয়েছে, অথবা পাত্রের উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়েছে, সেই পরিবারগুলিতে পণের চাহিদা থেকেছে সর্বাধিক।

শিক্ষা, সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে যা নিশ্চিহ্ন হওয়ার কথা ছিল, তা ‘অন্য’ রূপে, ক্ষেত্রবিশেষে আরও মার্জিত হয়ে সমাজের মধ্যেই মিশে থেকে ক্রমাগত মেয়েদের গার্হস্থ হিংসার শিকার বানিয়ে চলেছে। সমীক্ষা আরও দেখিয়েছে যে, ভারতের সর্বত্র এই প্রথা “বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়”-এর পর্যায়ে আটকে নেই। গবেষকরা ১৯৩০ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ৭৪,০০০-এরও বেশি ভারতীয় বিবাহ পর্যবেক্ষণ করে জানিয়েছেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পণপ্রথাতেও বিবর্তন এসেছে। এই তথ্য উদ্বেগের। ১৯৬১ সাল থেকেই ভারতে পণ দেওয়া এবং নেওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ। অথচ, ন্যূনতম পাঁচ বছরের জেল এবং আর্থিক জরিমানার ভয়ও এই কুপ্রথায় প্রভাব ফেলতে পারেনি। গত পাঁচ বছরে উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারে পণজনিত কারণে বধূমৃত্যু হয়েছে যথাক্রমে প্রায় বারো হাজার ও সাড়ে পাঁচ হাজার। তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের স্থানটি চতুর্থ। বলা বাহুল্য, এটা সম্পূর্ণ চিত্র নয়— যে সব ক্ষেত্রে দাম্পত্যসঙ্কটের মুখে কন্যাপক্ষ পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছে, কেবল সেই পরিসংখ্যানই রয়েছে রাষ্ট্রের হাতে। বরং জাতপাতে বহুবিভক্ত সমাজে সম্পদ বৃদ্ধি পেলে তা পণের চাহিদাও বাড়িয়ে তুলেছে।

তবে কি এই নির্যাতনের শেষ নেই? ভাবা গিয়েছিল, নারীশিক্ষার হার যত বাড়বে, মেয়েরা যত স্বনির্ভর হবে, ততই লাগাম পড়বে পণপ্রথায়। এখন দেখা যাচ্ছে, শুধুমাত্র প্রথাগত শিক্ষা যথেষ্ট নয়। কারণ, তা সব সময়ে মেয়েদের মধ্যে পুরুষের সম-মর্যাদার বোধ জাগিয়ে তুলতে পারে না। আর্থিক স্বনির্ভরতা মেয়েদের সক্ষমতা অবশ্যই বাড়াতে পারে, কিন্তু সমাজ এবং পরিবারের ভিন্ন ‘শিক্ষা’র বশবর্তী হয়ে বহু মেয়ে স্বেচ্ছায় কাজ ছেড়ে দেয়। পণপ্রথা এক সামাজিক অপরাধ, আরও বহু অপরাধের মূল। কন্যাপক্ষ পণের দাবি মেটালেও কন্যার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হয় না, তার নিদর্শন ঘরে ঘরে। তবু পণপ্রথার প্রতি আজও বিরক্তি জন্মায়নি। পণপ্রত্যাশী পাত্রকে সামাজিক ভাবে প্রত্যাখ্যান না করলে পণপ্রথা যাওয়ার নয়। কঠোর শাস্তি এবং নিরন্তর প্রচার ভিন্ন এ প্রথা থেকে মুক্তি নেই। যৌতুকের নামে আর কত প্রাণ বলি দিলে তবে সমাজ-প্রশাসনের টনক নড়বে?

Diabetes নীরব ঘাতক

ভারতে ডায়াবিটিসের হার উদ্বেগজনক। সাম্প্রতিক একটি নমুনা সমীক্ষার ফল থেকে ইঙ্গিত মিলেছে যে, ভারতে ডায়াবিটিস (মধুমেহ বা বহুমূত্র রোগ) আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা, যা এত দিন সাত কোটি মনে করা হচ্ছিল, বস্তুত দশ কোটি ছাড়িয়েছে। আরও তেরো কোটি মানুষ ডায়াবিটিসের ঠিক আগের ধাপে (প্রি-ডায়াবিটিস) রয়েছেন। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, এঁদের একটি বড় অংশের রক্তে শর্করা আরও বাড়ায় তাঁরা ডায়াবিটিসে আক্রান্ত হবেন, কারণ ভারতীয় তথা দক্ষিণ এশিয়ার বাসিন্দাদের মধ্যে প্রি-ডায়াবিটিস থেকে ডায়াবিটিসে এগোনোর হার বিশ্বে সর্বাধিক। পশ্চিমবঙ্গের মানুষেরও চিন্তার বিশেষ কারণ রয়েছে, বলছে সমীক্ষা। সংগৃহীত নমুনার ইঙ্গিত, এ রাজ্যে চার জনের এক জন রয়েছে প্রি-ডায়াবিটিস পর্যায়ে, চোদ্দো শতাংশ ডায়াবিটিসে আক্রান্ত। এই হার বিশ্বের গড় হার ৯.৩ শতাংশের (২০১৯) চাইতে অনেকটাই বেশি। এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসবে কী করে? কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যকলাপের দিকে তাকালে রোগ প্রতিরোধের কাজ আরও দুঃসাধ্য মনে হয়, কারণ অসংক্রামক ব্যাধি (ক্যানসার, ডায়াবিটিস, হৃদ্‌রোগ, স্ট্রোক প্রভৃতি) নিয়ন্ত্রণের খাতে এ বছর টাকা কমেছে। ২০২২-২৩ সালে সারা দেশের জন্য পাঁচশো কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল, ২০২৩-২৪ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৮৯ কোটি টাকা। এই টাকায় ভারতের মতো জনবহুল দেশে ডায়াবিটিস প্রভৃতি রোগের সচেতনতার প্রচার, প্রান্তিক এলাকায় রোগনির্ণয়ের শিবির করা, স্বাস্থ্যব্যবস্থার নানা ধাপের চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ, এবং অ-সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রীয় নীতিতে (২০১০) উল্লিখিত বিভিন্ন উদ্যোগ করা হবে, তা আন্দাজ করা বড়ই কঠিন।

অথচ, ভারতে কর্মক্ষম বয়সের মধ্যেও ডায়াবিটিসের প্রকোপ যথেষ্ট, তাই কর্মক্ষমতা হারানোর ফলে ভারতের জিডিপি-তে বহু কোটি টাকা ক্ষতির আশঙ্কা করেছেন বিশেষজ্ঞরা। অন্য দিকে, চিকিৎসার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ খরচ বহু পরিবারকে দারিদ্রসীমার নীচে ঠেলে দিচ্ছে। আশঙ্কার কারণ আরও এই যে, যে কোনও অসংক্রামক ব্যাধির মতো, ডায়াবিটিসেরও উৎস জীবনযাপনের শৈলী এবং খাদ্যাভ্যাসে। নগরায়ণ যত বেড়েছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ডায়াবিটিস। ১৯৩৮ সাল এবং ১৯৫৯ সালে ভারতের বড় শহরগুলিতে ডায়াবিটিসের হার ছিল মাত্র এক শতাংশ, বা তারও কম। আশির দশক থেকে তা দ্রুত বাড়তে শুরু করে, ২০০০ সালে তা দাঁড়ায় বারো শতাংশে। গ্রামের মানুষের ঝুঁকিও অবশ্য দ্রুত বাড়ছে, দেড় দশকের মধ্যে তাও দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে কোথাও।

ডায়াবিটিস অন্যান্য সংক্রমণের সম্ভাবনাও অনেক বাড়িয়ে দেয়, কোভিডের সময়ে সে তথ্য বার বার প্রচারিত হয়েছিল। ডায়াবিটিসকে তাই বলা হয় ‘নীরব ঘাতক’, আর বিশ্বের সর্বাধিক ডায়াবিটিস-আক্রান্ত ভারতকে বলা হয়, বিশ্বের ‘ডায়াবিটিস রাজধানী’। সরকার যাতে ডায়াবিটিসকে গুরুত্ব দেয়, তার জন্য সচেষ্ট হওয়া দরকার। কেবল সুলভ চিকিৎসা নয়, প্যাকেটজাত চটজলদি খাবারে ফ্যাট ও শর্করার পরিমাণ যথাযথ কি না, তাও দেখার কাজ খাদ্য ও ক্রেতা দফতরের। শৈশব থেকেই খেলাধুলো ও স্বাস্থ্যকর খাবারের অভ্যাস গড়ে ওঠা দরকার। নয়তো বিপদ আটকানো কঠিন।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

*Midday Meal Scheme*শিশুর বঞ্চনা

পুষ্টিবঞ্চিত হয়েছে এ রাজ্যের অসংখ্য পড়ুয়া। অভিযোগ, নির্ধারিত গরমের ছুটির আগে ও পরে ‘প্রবল গরমের কারণে’ যে বাড়তি ছুটি যোগ করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার,সেই সময় অনেকেই পায়নি মিড-ডে মিল। প্রশ্ন উঠেছে, পুষ্টির ক্ষেত্রে এই ঘাটতি পূরণ হবে কী ভাবে? প্রশাসনের তরফে এই বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলেই খবর। গত বছরেও অতিরিক্ত গরমের ছুটিতে বহু জায়গায় পড়ুয়াদের চাল, ডাল, সয়াবিন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এ বছর সেই ব্যবস্থা করা হয়নি। কেন, সেই নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। প্রশাসন অবশ্য ভাবতে পারে যে, এখন ছাত্রছাত্রীদের বকেয়া চাল-ডাল মিটিয়ে দিলেই চলবে, তা হলেই আর বঞ্চনা থাকবে না। সমস্যা হল, খিদে যেমন কোনও কিছুর অপেক্ষা করে না, সেই খিদে মেটানোর ব্যবস্থারও ছুটি ফুরানোর অপেক্ষায় থাকা চলে না। ভোটের বাজারে এই সহজ সত্যটি রাজনীতির নজর এড়িয়ে যাবে, তাতে অবশ্য অবাক হওয়ার কারণ নেই— ছোটদের ভোট নেই বলেই।

অতিমারিতে দীর্ঘ সময় স্কুল বন্ধ থাকাকালীন রাজ্যের স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিল প্রকল্প চালু রাখা সম্ভব হয়নি। স্কুল খোলার পর বিভিন্ন সমীক্ষায় প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষার পাশাপাশি পুষ্টির ক্ষেত্রেও লক্ষণীয় ঘাটতি দেখা গিয়েছিল। শুধু তা-ই নয়, লকডাউন চলাকালীন তাদের হাতে শুকনো খাবার হিসাবে যে খাদ্যসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়, তা-ও ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এখন তো অতিমারির অস্বাভাবিকতার অজুহাতটিও নেই, কিন্তু অব্যবস্থা অব্যাহত। মিড-ডে মিল প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পড়ুয়াদের পুষ্টি নিশ্চিত করা। কিন্তু দেখা গিয়েছে, শিশুদের যে পুষ্টির কথা ভেবে এই মিড-ডে মিলের খাদ্য-তালিকা তৈরি হয়েছিল, আর বাস্তবে তারা যা পেয়ে থাকে— উভয়ের হিসাব মেলে না। মূল্যবৃদ্ধির কারণে বহুসময়েই এই শিশুদের পাত থেকে উধাও হয়েছে ডিম বা ডালের মতো প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার, আপস করা হয়েছে খাবারের মানের সঙ্গে। অথচ, এই বছরই জানুয়ারি থেকে চার মাসের জন্য প্রতি সপ্তাহে পড়ুয়া-পিছু অতিরিক্ত কুড়ি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এ ক্ষেত্রে ভোট রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটকের কাজ করলেও শিশুরা অন্তত সপ্তাহে দু’দিন ফল ও মুরগির মাংসের দেখা পেয়েছিল। অর্থাৎ, সরকার শিশুদের পুষ্টির ঘাটতি ও তা পূরণেরপ্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিলক্ষণ জানে। রাজনৈতিক সুবিধা লাভের স্বার্থে সে বিষয়ে তৎপরও হয়। অথচ, অতিরিক্ত গ্রীষ্মের ছুটিতে যে শিশুরা পুষ্টি থেকে বঞ্চিত হবে, সে বিষয়ে আগাম কোনও নীতি নির্ধারণ করে না।

এই দ্বিপ্রাহরিক খাবার সরকারের দয়ার দান নয়। এটি শিশুদের অধিকার। কখনও স্কুল বন্ধ, কখনও মূল্যবৃদ্ধির অজুহাতে শিশুরা সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মিড-ডে মিল নিয়ে সরকারের স্পষ্ট নীতির অভাব এবং অসাধুতা এ রাজ্যের বহু শিশুর স্বাস্থ্যকেই এক অপূরণীয় ক্ষতির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। শিশুদের দৈহিক এবং মানসিক বাড়বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পুষ্টির চাহিদাটা এমনই যে, সঠিক সময়ে তা না পূরণ হলে পরে হাজার প্রচেষ্টাতেও সেই ঘাটতি পূরণ করা যায় না। সর্বোপরি, শিশুর পুষ্টি বাদ দিয়ে কোনও জনকল্যাণমূলক প্রকল্প সফল হতে পারে না। তাই পুষ্টির সঙ্গে কোনও মূল্যেই আপস চলবে না— সর্বাগ্রে এই কথাটি সরকারকে মানতে হবে।

*Child Rights*শৈশবহীন

শিশুশ্রম নিবারণের জন্য প্রতি বছর জুন মাসে আন্তর্জাতিক শিশুশ্রম-বিরোধী দিবস পালিত হয়। ভারতেও এই বিষয়ে নির্দিষ্ট আইন আছে। তা সত্ত্বেও কারখানায়, দোকানে গোপনে শিশুশ্রমের ধারাটি অব্যাহত থাকে। আর এক ধরনের শ্রমে অবশ্য শিশুদের ব্যবহার করা হয় প্রকাশ্যেই। বিনোদন দুনিয়ায়। বিনোদনের চাকচিক্যের আড়ালে শিশুশ্রমের মতো ভারী কথা চাপা পড়ে যায় ঠিকই, কিন্তু অধিকারের প্রশ্নগুলি সেখানেও তোলা সঙ্গত। সম্প্রতি ন্যাশনাল কমিশন ফর প্রোটেকশন অব চাইল্ড রাইটস (এনসিপিসিআর) যে নির্দেশিকা দিয়েছে, তাতে বলা হয়েছে শিশু ও নাবালক শিল্পীদের দিয়ে দিনে পাঁচ ঘণ্টার বেশি কাজ করানো যাবে না। শিশুটির নিয়মিত স্কুলে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে প্রযোজনা সংস্থাকে। পোশাক পরিবর্তনের জায়গা আলাদা রাখতে হবে, অন্তত এক জন অভিভাবককে সব সময় সঙ্গে থাকতে হবে, ইত্যাদি। শিশুশিল্পীর সার্বিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এই নির্দেশিকা গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু এর পরেও একটি প্রশ্ন অনালোচিত থেকে যায়— শৈশবের অধিকার। শিশু স্বভাবতই আত্মভোলা। নিজেকে নিয়ে সে ব্যস্ত নয়। বরং সদ্য চেনা জগৎসংসার নিয়ে তার বিস্ময়ের, জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। অথচ, মেধা বিকাশের নামে আজকের বিনোদন জগতে তাদের যে ভাবে ব্যবহার করা হয়, তাতে শৈশব আর বেঁচে থাকে না। প্রতিযোগিতার দুনিয়ায় সে নিজেকে নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত সচেতন হয়ে ওঠে, নিজের উপস্থাপনাকে আরও বেশি আকর্ষক করা নিয়ে মশগুল থাকে। উপস্থাপনা, তার দীর্ঘ অনুশীলন, তারই মাঝে সময় করে পড়া, সাফল্যের উচ্ছ্বাস, নয়তো ব্যর্থতার অবসাদ— এই চক্রের মধ্যেই আবর্তিত হয় তাদের জীবন। নিয়মহারা, হিসাবহীন বয়সের ধর্ম অকালে হারিয়ে যাওয়া তাদের মনোজগতে কেমন ঝড় তোলে, সে বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করা হয় না। দাবি করা হয়, সারা দিনের শুটিং-এর ফাঁকেই শিশুশিল্পী পড়ে, খেলেও। কিন্তু শিশুর বেড়ে ওঠার জন্য শুধু তো এইটুকু যথেষ্ট নয়। তার মনের সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর নিবিড় সংযোগ প্রয়োজন। সেটা অক্ষুণ্ণ থাকে কি? আইনে শিশুনিগ্রহ রোখার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু শিশুর সহজ, সরল চরিত্রটিকেই বদলে দেওয়ার উদ্যোগ করা হলে সেটাও কি এক ধরনের নিগ্রহ নয়?সবচেয়ে ভয়ের কথা, শৈশব হারিয়ে যাওয়ার এই সম্ভাবনায় শিশুর অভিভাবকেরাও বিন্দুমাত্র ভাবিত নন। তাই প্রায়শই এমন নাচ, গান, অভিনয় তাদের দিয়ে করিয়ে নেওয়া হয়, যেগুলি আদৌ তাদের বয়সের পক্ষে মানানসই নয়, সে সবের মানেও তারা বোঝে না। মনে রাখা প্রয়োজন, নিছক হাততালি কুড়োনোর এই আয়োজন এক অর্থে শিশুদের পণ্য বানিয়ে তোলা। শৈশব হারিয়ে শিশু যদি পণ্য হয়ে ওঠে, তবে এর চেয়ে দুঃখজনক কিছু হয় না। এ ক্ষেত্রে অভিভাবকেরও যে বিশেষ আপত্তি দেখা যায় না, তার কারণ— সন্তানের কৃতিত্বে মা-বাবার নিজেদের আলোকিত হয়ে ওঠার ইচ্ছাটাই প্রধান হয়ে ওঠে। তাই শিশুর স্কুলে না গিয়ে দশ-বারো ঘণ্টা সেটে সময় কাটানোতেও তাঁদের সায় থাকে। শৈশব সুরক্ষিত করতে শিশুকে বোঝানো প্রয়োজন, প্রতিযোগিতাটাই জীবন নয়, জীবনের অর্থ আরও বৃহৎ। মঞ্চের কৃত্রিমতার বাইরেও এক সুস্থ, স্বাভাবিক পৃথিবী আছে, তার রং, রূপ নিয়ে। প্রশ্ন হল, অভিভাবকরাই অ-বুঝ হলে বোঝাবে কে?

*Hospitals*অধিক ওষুধে

তৃতীয় স্থানে ভারত। কোনও উন্নয়নের নিরিখে নয়, ‘হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড অ্যান্টিবায়োটিক রেসিসট্যান্ট ইনফেকশন’ (সংক্ষেপে ‘হারি’)-এর সাপেক্ষে। ৯৯টি দেশে পরিচালিত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, ভারতে প্রতি বছর প্রায় নব্বই লক্ষ মানুষ হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে থাকাকালীন নানান ব্যাক্টিরিয়াজনিত সংক্রমণের শিকার হন। তথ্যটি উদ্বেগজনক। প্রসঙ্গত, এই ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী ব্যাক্টিরিয়ার সংক্রমণে, যাদের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক জীবাণুগুলিকে সুপারবাগ বলা হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রথম সারির অ্যান্টিবায়োটিক কোনও কাজ করে না। সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সারি কিংবা সর্বোচ্চ মাত্রার অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করতে হয়, যেগুলি শুধু দামিই নয়, অনেক সময় মানবশরীরের পক্ষে রীতিমতো ক্ষতিকারক। এ দেশে উচ্চতর সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতাল কিংবা নার্সিং হোম এই ধরনের সংক্রমণের আঁতুড়ঘর। আরও উদ্বেগের যে, ভারতে এখনও এই ধরনের মারাত্মক সংক্রমণ নির্ণয়ের কোনও উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই। যদিও এই সমস্যা শুধু ভারত নয়, গোটা বিশ্বের।

হাসপাতালে বিবিধ ভাবে এমন সংক্রমণ ছড়াতে পারে। রোগীকে ক্যাথিটার লাগানোর ফলে, ওষুধ প্রয়োগের জন্য শরীরে নল ঢোকানোর কারণে, অস্ত্রোপচারের পরে কিংবা ভেন্টিলেশনে রাখলে এই সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়ে। বহু ক্ষেত্রে চিকিৎসা সরঞ্জামগুলির জীবাণুমুক্তিকরণে ত্রুটি, আবার কোনও সময়ে রোগীর চাপে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নতিস্বীকারের ফলে রোখা যায় না সংক্রমণ। তবে সমস্যা শুধুমাত্র হাসপাতালেরই নয়, গাফিলতি রয়েছে জনসাধারণের তরফেও। গত বছরের সেপ্টেম্বরেই *ল্যানসেট*-এর এক সমীক্ষায় জানা গিয়েছিল, ভারতীয়দের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার প্রবণতা অত্যধিক। অতিমারি পর্বে যা আরও ঊর্ধ্বগামী হয়। চিকিৎসকের পরামর্শ মতো নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অ্যান্টিবায়োটিক না খাওয়া বা অকারণ ও অত্যধিক অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার ফলে শরীরে উপস্থিত ব্যাক্টিরিয়া ওই ওষুধের সঙ্গে লড়াইয়ের ক্ষমতা অর্জন করে ফেলে। এর ফলে, আগামী দিনে এই ধরনের ‘সুপারবাগ’-গুলির সঙ্গে লড়াই করার মতো প্রয়োজনীয় ওষুধ পাওয়া যাবে না বলেও আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের। সমস্যা হল, অ্যান্টিবায়োটিকের উপরে রাশ টানার বিষয়টি এ দেশে নতুন নয়। কিন্তু বিনা প্রেসক্রিপশনে অ্যান্টিবায়োটিকের সহজলভ্যতা ইন্ধন জুগিয়েছে এই প্রবণতায়। আজও এক শ্রেণির চিকিৎসক অপ্রয়োজনে অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগের উপরেই ভরসা করেন।

আগামী দিনে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণে ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন হবে এ দেশের জনস্বাস্থ্য। ফলে, সতর্ক হতে হবে চিকিৎসক, জনগণ— উভয়কেই। অসুস্থ হলে নিজের চিকিৎসা নিজেই করার নির্বুদ্ধিতা না দেখিয়ে, রোগীকে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, অসুখ সারানোর দায়িত্ব চিকিৎসকের। একই সঙ্গে সংক্রমণ রোধে হাসপাতালগুলিকে জানতে হবে কী ধরনের জীবাণু সংক্রমণ ছড়াচ্ছে, কত জন রোগী তাতে আক্রান্ত হয়েছেন, কী ভাবে নিরাময় সম্ভব। নিয়মিত এই ধরনের সংক্রমণের হার বা মৃত্যুর তথ্য জনসমক্ষে আনতে হবে। সচেতনতাই বাঁচার পথ।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -
https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

*Childern*আশ্রয়ের খোঁজ

শৈশব এক নিশ্চিন্ত আশ্রয় চায়, চায় সুরক্ষাও। কিন্তু নানাবিধ কারণে যারা সেই স্বস্তির জায়গাটুকু থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তাদের উপযুক্ত আশ্রয় জোগানোর দায়িত্ব কি সরকার এবং সমাজ, উভয়েরই নয়? এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শিশুপালন সংস্থা এবং ছোটদের হোমে প্রায় চার হাজার শিশু আশ্রয়ের অপেক্ষায় রয়েছে। গত বছর আনুষ্ঠানিক ভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সূচনা করেছিল ‘ফস্টার কেয়ার’ বা পালক পরিচর্যা প্রকল্পের। এ-যাবৎ তিনটি শিশু এই প্রকল্পের মাধ্যমে পালক অভিভাবকদের পেয়েছে। আরও সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ করতে চান প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা। এই প্রকল্পে এক দিকে ঘরহীন, অভিভাবকহীন শিশুরা গৃহপরিবেশে বেড়ে ওঠার সুযোগ পাবে। অন্য দিকে, সন্তানহীন বা সন্তান দূরে থাকে— এমন অভিভাবকরাও সন্তানসুখ পাবেন। অর্থাৎ, দু’তরফের অভাববোধকে এক সুতোয় বুনে এক ইতিবাচক, সুস্থ যাপনের দিশা দেখায় এই প্রকল্প।

দত্তক নেওয়ার সঙ্গে পালক পরিচর্যার বেশ কিছু মৌলিক পার্থক্য আছে। প্রধান পার্থক্য, পালক পরিচর্যা সাময়িক বন্দোবস্ত, আইনসঙ্গত দত্তক গ্রহণের মতো স্থায়ী নয়। মূলত সেই সব শিশুর কথা ভেবেই পালক পরিচর্যার প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে, যারা দত্তক গ্রহণের উপযুক্ত বলে ঘোষিত হওয়ার দু’বছর পরেও অভিভাবক খুঁজে পায়নি। অনেক ক্ষেত্রে কোনও শিশুর মা-বাবা দু’জনেই জেলে গেলে এবং তাদের দায়িত্বগ্রহণে পরিবারের কেউ অগ্রসর না হলেও তারা মা-বাবার অনুমতিসাপেক্ষে পালক পরিচর্যার জন্য বিবেচিত হতে পারে। অন্য দিকে, আনুষ্ঠানিক ভাবে দত্তক গ্রহণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে যেখানে কয়েক বছর লাগে, সেখানে পালক পরিচর্যার ক্ষেত্রে মাত্র দু’মাসের মধ্যেই শিশুকে কাছে পাওয়া যায়। দত্তক নেওয়ার মতো অভিভাবকদের সম্মিলিত বয়সসীমাও এই ক্ষেত্রে বিচার্য হয় না। যদি দু’বছর সফল ভাবে পরিচর্যার পর শিশুটিকে দত্তক নেওয়ার জন্য অভিভাবকরা আবেদন জানান, তবেই তাঁদের বয়স বিচার্য হয়।

কয়েক দশক আগেও কোনও শিশু অভিভাবকহীন হলে, অথবা মা-বাবা শিশুর দায়িত্বগ্রহণে অপারগ হলে বর্ধিত পরিবার এগিয়ে আসত শিশুর দায়িত্বগ্রহণে। কিন্তু পরিবর্তিত আর্থসামাজিক পরিস্থিতি এবং অণু পরিবারের জন্ম ‘ফস্টার কেয়ার’-এর প্রয়োজনীয়তা অনেক গুণ বৃদ্ধি করেছে। সর্বোপরি, এই স্বেচ্ছাসেবামূলক প্রকল্পের মধ্য দিয়ে মানবিক সম্পর্কগুলি আরও দৃঢ় হওয়ার আশা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নজরদারি আবশ্যক। পরিচর্যার নামে শিশুশ্রমের ব্যবহার বা বঞ্চনা— দুই-ই অপরাধ। সে অপরাধের সম্ভাবনা গোড়াতেই বিনাশ করা ভাল। সুতরাং, অভিভাবক বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সতর্কতা এবং স্বচ্ছতা জরুরি। পালক পরিচর্যায় থাকাকালীন যাতে শিশুর দেখাশোনার কাজটি যথাযথ হয়, সে বিষয়টি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে, এবং এই কাজে যথেষ্ট সংখ্যক কর্মী নিয়োগ করতে হবে। সর্বোপরি, সমগ্র প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ভাবে কাজ করছে কি না, প্রাথমিক পর্যায়ে তার পর্যালোচনাও একান্ত প্রয়োজন। ভারতের মতো দেশে আইন সত্ত্বেও শিশুশ্রম বা শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ করা যায়নি। মানবিক কাজের বর্মের আড়ালে যাতে সেই কুকর্মগুলি ফের মাথা-চাড়া দিতে না পারে, তা দেখা জরুরি বইকি।

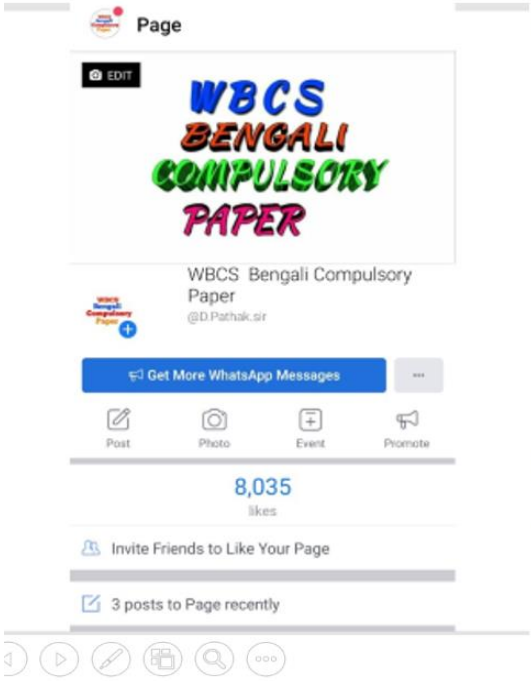

WBCS Bengali Compulsory Paper

- ❖*Online class –Sunday 8am*
- ❖*RECORDED VIDEO*
- ❖*Log in id*
- ❖*Mock test* - Monday and Friday
- ❖Live mock - *সোমবার ও শুক্রবার 9.30pm*
- ❖*Model Answer*
- ❖**CLASS -200/month**
- ❖**WhatsApp: 8537872204**

By Pathak sir

WBCS Bengali Compulsory Paper .com
https://wbcsbengalicompulsorypaper.com

নিয়মিত অনুশীলন

LIVE MOCK

বাড়ি থেকে পরীক্ষা -*প্রশ্নপত্র দেওয়া হবে –*pdf করে লিখে পাঠাতে হবে। সপ্তাহে সোমবার ও শুক্রবার **print করে খাতা দেখা হবে / খাতা দেখার পর মোডেল উত্তরপত্র দেওয়া হবে /লেখাগুলো **7047352328** নাম্বারে পাঠাতে হবে

- ❖**Fees - ₹ *100* / month**
- ❖**WhatsApp: 8537872204**

By Pathak sir